# সোনার আলপনা

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

Scanned with CamScanner

# সূচীপত্র


| | |
|---|---|
| বালজাক, অনরা দ্য | ১১ |
| জর্জ সাঁদ | ২৩ |
| গী দ্য মোপাসাঁ | ৩৫ |
| ফাঁসোয়া মোরিয়াক | ৫২ |
| জাঁ-পল সার্ত্র্ | ৬৩ |
| আলবের কাম্যু | ৭৬ |
| গ্যাব্রিয়েলা মিস্ত্রাল | ৮৫ |
| গারথিয়া লরকা | ৯০ |
| গ্যাব্রিয়েল দান্নুন্‌ৎসিও | ৯৮ |
| ইনিয়াৎসিও সিলোনে | ১০৯ |
| আলবার্তো মোরাভিয়া | ১১৫ |
| হেরমান হেসে | ১২২ |
| স্টেফান ৎসভাইক | ১৩২ |
| হেনরিক ইবসেন | ১৪১ |
| অগাস্ট স্ট্রীন্ডবার্গ | ১৫১ |
| পার লাগেরকভিস্ট | ১৬৩ |
| হালডোর ল্যাক্সনেস | ১৬৯ |
| ইভান তুর্গেনেভ | ১৮২ |
| দস্তয়েভস্কি | ১৯২ |
| এলিজাবেথ ডিকিন্‌সন | ২১০ |
| আর্নেস্ট হেমিংওয়ে | ২১৯ |
| চার্লস ল্যাম | ২২৮ |
| জন কীট্‌স্ | ২৩৭ |
| আর্নেস্ট ডাউসন | ২৫০ |


Scanned with CamScanner

# জন কীট্‌স্

## ১৭৯৫—১৮২১

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ড। ঘোড়ার গাড়ি তখন প্রধান বাহন যাতায়াতের ; ডাক চলে দেশের সর্বত্র ; ডাকগাড়িতে চড়ে যাত্রীরাও যায় দূরে দূরে। বড়লোকের বিলাস জুড়ি-গাড়ি তো আছেই। সুতরাং সে-যুগের প্রয়োজন মেটাতে লণ্ডন শহরে বড় বড় গাড়ি-ঘোড়ার ব্যবসা স্থাপিত হয়েছিল। এমনি একটা ব্যবসাকেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন টমাস কীট্‌স্।

নিচে ঘোড়ার আস্তাবল, গাড়ির আস্তানা,—উপরতলায় থাকেন টমাস। তাঁর ভাগ্য ভালো ; মনিবের মেয়ে তাঁর প্রেমে পড়েছিলেন। পরিবারের নিষেধ অগ্রাহ্য করে ফ্রান্সেস্ টমাসকে বিয়ে করে এই বাড়িতে এসে উঠেছেন। নিচেরতলা সর্বদা মুখরিত থাকে গাড়ির চাকার শব্দে, ঘোড়ার কর্কশ হ্রেষায় এবং লোহার জুতোপরানো খুরের আঘাতে। ১৭৯৫ সালের অক্টোবর মাসের এক কুয়াশাচ্ছন্ন দিনে একটি নবজাত শিশুর কান্নার অভিনব শব্দ একঘেয়ে কোলাহলের সঙ্গে যুক্ত হল। বাপ-মা প্রথম সন্তানের নাম রাখলেন জন, জন কীট্‌স্ (John Keats). সেদিন কে জানত এই অসুন্দর পরিবেশের মধ্যে ভবিষ্যৎ যুগের একজন অন্যতম সৌন্দর্যসাধক প্রথম চোখ মেলে চাইবেন।

কীট্‌সের কবি-প্রতিভার কোনো পরিচয় তাঁর ছেলেবেলায় পাওয়া যায়নি। সাত বছর বয়সে তাঁকে স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। কথায় কথায় সহপাঠীদের সঙ্গে লড়াই লেগে যেত। প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে পেরে উঠবেন কিনা সে প্রশ্ন মনে জাগত না ; কোনো ছুতো পেলেই উন্মাদের মতো কিল-ঘুষি চালাতে আরম্ভ করতেন বিরোধী পক্ষের উপর। কীট্‌সের ছোট দু'ভাই—জর্জ এবং টমও তখন তাঁর স্কুলে ভর্তি হয়েছে। একদিন স্কুলের লম্বা-চওড়া এক কর্মচারী দুষ্টুমির জন্য টমের কান মলে দিল। অপমানে জ্বলে উঠলেন কীট্‌স্ ; প্রচণ্ড বেগে তাকেই আক্রমণ করলেন ঘুষি বাগিয়ে। অথচ লড়াই করবার উপযুক্ত চেহারা তাঁর ছিল না, একটু বেঁটে, ছোট-খাটো দেখতে। কিন্তু গ্রীক দেবতা অ্যাপলোর মতো অপূর্ব সুন্দর মুখ ; মাথায় সোনালি চুলের গুচ্ছ ; স্বপ্নময় বাদামি চোখ। যখন উদ্দীপ্ত হয়ে লড়াই করতেন তখন তাঁর উপর থেকে দৃষ্টি ফেরানো যেত না। মনে হত যেন পুরাণের কোনো দেবশিশু যুদ্ধে নেমেছেন। স্কুলে যারা তাঁকে দেখেছে তারা ভাবত সৈন্যবিভাগে যোগ দিয়ে পরবর্তী জীবনে কীট্‌স্ উন্নতি করবেন। মৃত্যুর তিন বছর আগে কীট্‌স্ লিখেছিলেন : "জীবনের যাত্রারম্ভে দুঃখের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, ভেবেছিলাম, তাকে পশ্চাতে ফেলে আমি যাব এগিয়ে, কিন্তু আমার প্রতি একনিষ্ঠ তার ভালোবাসা, মমতা গভীর ; ছলনায় ভুলিয়ে তার



Scanned with CamScanner

সঙ্গ ত্যাগ করতে চেয়েছি, কিন্তু, হায়, সে সাধ্বী মমতাময়ী স্ত্রীর মতো কিছুতেই ছাড়বে না আমাকে।"

ন' বছর বয়সে দুঃখের সঙ্গে তাঁর মুখোমুখি পরিচয় ঘটল। অকস্মাৎ ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে কীটসের বাবার মৃত্যু হয়। পিতৃশোকের ক্ষতটা মিলিয়ে না যেতেই মা রলিংস নামে এক ভদ্রলোককে বিয়ে করলেন।

এ বিয়ে সুখের হল না ; সুতরাং বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেল অল্পদিনের মধ্যে। কীটসের মা তিন ছেলে এবং এক মেয়ে নিয়ে পিতৃগৃহে আশ্রয় নিলেন। কীট্‌স্ মা'কে বড় ভালোবাসতেন। তাঁর বয়স যখন মাত্র পাঁচ বছর, তখন কী একটা অসুখে মা শয্যাশায়ী। ডাক্তার এসে নির্দেশ দিল কেউ যেন রোগীর কাছে এসে তাঁর বিশ্রামের ব্যাঘাত না ঘটায়। পাঁচ বছরের বালক একথা শুনতে পেয়ে কোথা থেকে একটা মরচে-পড়া পুরনো তলোয়ার সংগ্রহ করে দরজায় পাহারা দিতে দাঁড়িয়ে গেল। মাকে আশ্রয় করেই হয়ত কীট্‌সের শৈশব স্নিগ্ধ শান্তিতে কেটে যেতে পারত। কিন্তু এটুকু সৌভাগ্যও কীট্‌সের ছিল না। পনেরো বছর বয়স পূর্ণ না হতেই মা'কে হারাতে হল। মায়ের সেবার সকল ভার ছিল কীট্‌সের উপর। সদা উদ্যত মুষ্টি জঙ্গী কিশোরটি সহসা মা'র জন্য স্নেহ-মমতায় গলে গেলেন। যন্ত্রণাক্লিষ্ট মায়ের পাশে বসে কত বিনিদ্র রাত কাটিয়েছেন কীট্‌স্ ; নিজের হাতে ওষুধ ঢেলে দিয়েছেন, রোগীর পথ্যও প্রস্তুত করতেন নিজে ; মা যখন একটু ভালো থাকতেন তখন বই পড়ে শোনাতেন। এত করেও মা'কে ধরে রাখা গেল না। যে-রোগে তিনি মারা গেলেন তার আক্রমণ থেকে সে-যুগে কেউ রক্ষা পায়নি। রোগটি যক্ষ্মা। রোগ সাংঘাতিক হলেও তা যে সংক্রামক, এ-কথা তখন কেউ জানত না। রোগীর সাহচর্যের সুযোগে অলক্ষ্যে কীট্‌সের অদৃশ্য দেহকোষে যক্ষ্মার জীবাণু উপ্ত হয়ে রইল।

মা'র মৃত্যু গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করল কীট্‌সের জীবন। বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা, কথায় কথায় ঘুষি বাগানো,—সব বন্ধ হয়ে গেল। তাঁর একমাত্র সঙ্গী হল বই। বইয়ের মধ্যে ডুবে গেলেন। সব সময় বই নিয়ে আছেন। স্কুল লাইব্রেরীর বই পড়া শেষ হল। হেডমাস্টার মহাশয়ের ব্যক্তিগত সংগ্রহের বইও বাকি থাকল না। হেডমাস্টারের ছেলে কাউডেন ক্লার্ক ছিলেন কীট্‌সের সাহিত্য-চর্চার সঙ্গী ও উৎসাহদাতা।

সাহিত্য-পাঠ সৃষ্টির প্রেরণা যোগালো। কীট্‌সের প্রথম রচিত কবিতাগুলি সমর্থন পেল ক্লার্কের কাছ থেকে। লী হান্টের তখন নবীন সাহিত্যিকদের মধ্যে উচ্চ আসন। তিনি 'এগজামিনার' পত্রিকার সম্পাদক ; তাঁর বাড়িতে নবীন সাহিত্যিকদের অবারিত দ্বার। ক্লার্ক কীট্‌স্‌কে নিয়ে এলেন হান্টের বাড়ি। হান্ট শুধু মুখে উৎসাহ দিলেন না, তাঁর কাগজে কীট্‌সের কবিতাও ছাপলেন। কীট্‌সের কবিতা ছাপার অক্ষরে সেই প্রথম বের হল। সেটা ১৮১৬ সাল। লী হান্ট 'নবীন কবি' নাম দিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখলেন কয়েকদিন পরে। তিনি সেই প্রবন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, আজকের অখ্যাত তরুণ কবি শেলী, কীটস্ ও রেনল্ডস্ একদিন বিশ্ববিখ্যাত হবেন। রেনল্ডস্ কবিতা ছেড়ে চিত্রশিল্পে নাম করেছিলেন ; অন্য দু'জন সম্বন্ধে হান্টের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয়নি। হান্টের বাড়িতেই শেলীর সঙ্গে কীট্‌সের আলাপ হয়। সে আলাপ আজীবন বন্ধুত্বে পরিণত হতে দেরি হয়নি।

স্কুলের পড়া শেষ করে কীট্‌স্ ডাক্তারি শিখবেন বলে এক সার্জনের কাছে শিক্ষানবিসী আরম্ভ করেছেন। কিন্তু এ কাজ তাঁর ভালো লাগে না। কাব্যরসে যাঁর মন ডুবে আছে তাঁর কী করে ভালো লাগবে হাসপাতালে রোগীর সঙ্গ এবং ওষুধের বিকট গন্ধ ? ডাক্তারের কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ চোখে পড়ে জানালার ফাঁক দিয়ে গলে-আসা-সূর্যের রশ্মি। সেই



সূর্যালোকে কত ধুলো-বালির কণা ভেসে বেড়ায়, কত রঙের খেলা ফুটে ওঠে। কীট্‌সের মন সেই সূর্যরশ্মির পথ বেয়ে চলে যায় কোন এক অজানা রূপকথার রাজ্যে। পেছনে পড়ে থাকে হাসপাতাল আর ওষুধের শিশি। কিন্তু উপায় নেই ; অভিভাবকের আদেশে এসেছেন এপথে। ডাক্তারিতে পয়সা আছে। তবু উপদেশ অগ্রাহ্য করে, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভয় না করে, হাসপাতাল থেকে একদিন বেরিয়ে এসে শুরু করলেন কাব্য-লক্ষ্মীর শিক্ষানবিসী।

তার আগেই কীট্‌সের প্রথম কাব্য-গ্রন্থ বেরিয়েছে। বন্ধুদের আশা ছিল, রসিক-সমাজে কবিতাগুলি অভ্যর্থনা লাভ করবে। কিন্তু ম্যাসখানেক পরে প্রকাশক জানালেন, এ-বই বের করে বড় ভুল করেছেন। যে-ক'খানা বই বিক্রি হয়েছিল, তাদের ক্রেতারাও বই ফিরিয়ে দিয়ে দাম চাইছে। টাকা ফিরিয়ে দিতে দ্বিধা করলে যাচ্ছেতাই করে গালাগাল দেয়। বন্ধুরা হতাশ হল ; কীটসও। বাস্তব জীবনের আঘাতে স্বপ্নের ফানুস বুঝি একটু টোল খেল। কিন্তু অদম্য আশাবাদী মন ; কাব্যসাধনা ছাড়লেন না কীট্‌স্। হাত দিলেন দীর্ঘকাব্য 'এনডাইমিয়ন' রচনায়। ছ'মাসের মধ্যে শেষ করা চাই।

ডাক্তারি পড়া ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই কীটস্ দু'ভাই জর্জ ও টমকে নিয়ে লণ্ডন ত্যাগ করে উঠে এসেছেন হ্যাম্পস্টেডে। ছোট বোন থাকে দূরে, স্কুলে পড়ে। এখানে উঠে এলেন প্রধানত লী হান্টের সঙ্গলোভে। শেলীও তখন হ্যাম্পস্টেডে আছেন হান্টের বাড়িতে। তাছাড়া ঐ অঞ্চলে কীট্‌সের গুণগ্রাহী বন্ধুও ছিল কয়েকজন।

ব্রাউন ও ডিল্‌ক দুই বন্ধু মিশে হ্যাম্পস্টেডে একটা বাড়ি তৈরি করেছেন। দুই বন্ধুর দুই পৃথক অংশ। ব্রাউন বিয়ে করেননি ; কেউ নেই তাঁর। প্রত্যেক বছর ছ' মাসের জন্য তাঁর অংশ ভাড়া দিয়ে তিনি ইংলণ্ডের নানা জায়গা ঘুরতে বেরিয়ে পড়েন। এবার ভাড়া দিলো শ্রীমতী ব্রন নামে এক বিধবা মহিলার কাছে ; তাঁর দুই মেয়ে, এক ছেলে। ব্রাউন কীটস্‌কে আহ্বান করলেন তাঁর ভ্রমণের সঙ্গী হতে। সানন্দে রাজি হলেন কীটস্। এদিকে তাঁর ভাই জর্জ বিয়ে করেছে ; কিন্তু বড় আর্থিক অনটন, উপার্জনের পথ নেই। তাই জর্জ ঠিক করল, সে সস্ত্রীক আমেরিকা যাবে জীবিকার সন্ধানে। ওদের জাহাজে তুলে দিয়ে কীট্‌স্ ব্রাউনের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন।

ভ্রমণ শেষ না হতেই খবর এল টম বড় অসুস্থ। কীট্‌স্ তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন। সেই মায়ের রোগ। ক্ষয় রোগে ধরেছে টমকে। কীট্‌স্ আবার রোগীর পরিচর্যায় আত্মনিয়োগ করলেন। ছেলে বয়সে মা-বাবা মারা গেছেন ; কীট্‌সের কাছেই মানুষ হয়েছে টম। চিকিৎসার টাকা নেই। মা যে নগদ টাকা রেখে গিয়েছেন তাই দিয়ে চলেছে এতদিন কিন্তু এই সাংঘাতিক রোগের চিকিৎসার সম্বল হাতে নেই। দাদামশাই উইল করে চার ভাইবোনের জন্য টাকা রেখে গেছেন। কীট্‌স্ গেলেন একজিকিউটারের কাছে। তিনি টাকা দেবেন না ; কারণ টম ও তাঁদের বোন তখনো সাবালক হয়নি। কীট্‌স্ অনুনয় করলেন নগদ টাকা চাই না, ডাক্তার ও ওষুধের বিল মিটিয়ে দিন। কিন্তু তাও হবে না। আসলে কীট্‌স্ যে একদিন ঐর আদেশ অমান্য করে ডাক্তারি পড়া ছেড়ে দিয়েছিলেন, তারই শোধ নিচ্ছেন ভদ্রলোক।

টমের পরিচর্যা করতে করতে কীট্‌স্ প্রায়ই নিজের মৃত্যুর ছায়া দেখতে পেতেন। ঐ সময়ের অনেক রচনায় মৃত্যুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু মৃত্যু শুধুই ক্ষণিকের ছায়া ফেলেছিল কীট্‌সের কবিতায়। চিরন্তন সৌন্দর্য তাঁর প্রেরণার মূল উৎস ছিল। মৃত্যুভয় সে উৎসকে শুকিয়ে দিতে পারেনি। এই সৌন্দর্য-সাধনাকে বিদ্রূপ করলে কীট্‌স্ আহত হতেন। 'ব্ল্যাকউড ম্যাগাজিন' এবং 'কোয়ার্টার্লি' রিভিয়ু' ঠিক তাই করল। কীট্‌সের 'কবিতাবলী'



Scanned with CamScanner

এবং 'এনডাইমিয়ন'-এর উপর সমালোচনার নামে এ দু'টি কাগজ অভদ্র আক্রমণ প্রকাশ করতে দ্বিধা করল না। সে আক্রমণে এমন প্রচণ্ড আঘাত ছিল যে শেলী, বায়রন প্রভৃতি অনেকেই ভেবেছিলেন যে, এজন্যেই কীট্‌সের অকাল মৃত্যু হয়েছে। বায়রন তো ছড়া লিখেছিলেন কীট্‌সের মৃত্যুর পর :

"কে মেরেছে কীট্‌সকে ?
'আমি', বলল কোয়ার্টার্লি।"

'ব্ল্যাকউড ম্যাগাজিন' লিখল : "ছোকরা কীট্‌স্ ছিল এক ওষুধের দোকানের শিক্ষানবিস ; একদিন এক মাত্রা জোলাপের ওষুধ রোগীর বাড়ি পৌঁছে দেবার পথে লোভের বশে খেয়ে ফেলল। এর ফলে যে-সব সাংঘাতিক লক্ষণ দেখা দিল,—ছড়া আবৃত্তি করা তার মধ্যে একটি। এই ছড়াগুলিতে এমন নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ পেয়েছে যার তুলনা নেই।... সুতরাং বাপু কীট্‌স্, ফিরে যাও ওষুধের দোকানের বড়ি, মলম ও প্লাস্টারের মধ্যে ; কবিতা ছেড়ে সেই কাজে লেগে থাকো।"

এর চেয়ে বড় হয়ে আর কোন আঘাত কীট্‌সের মনে বাজেনি। সুযোগ পেলেই কাগজ দু'টো নিয়ে বসতেন ; একাগ্র মনে দিনের পর দিন তাঁর কবিতার উপরে নির্মম কশাঘাতের চেহারাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতেন। এতো পড়া নয়, যেন তীব্র বিষ পান। সেই বিষে কী নেশা ছিল, তাই কীট্‌স্ যখন-তখন কাগজ দুটো তুলে নিতেন। প্রথম বড় হতাশ হয়ে পড়েছিলেন ; তাঁর প্রকাশক টেলরকে বলেছিলেন, "আর কবিতা লিখব না।" কিন্তু নৈরাশ্য সাময়িক। কিছুদিন পরে আমেরিকায় জর্জকে লিখলেন কীট্‌স্ : "আমার বিশ্বাস, মৃত্যুর পরে ইংরেজ কবিদের মধ্যে আমার নাম থাকবে।"

১৮১৮ সালের ১লা ডিসেম্বর। শীতার্ত সকাল। কীট্‌স্ এসে বন্ধু ব্রাউনকে ঠেলে ঘুম ভাঙালেন : ওঠ, টম আর নেই।" সংসারের আর কোন বন্ধন রইল না কীটসের। ব্রাউন বললেন, "একা একা থাকবে কেন ? আমার এখানে চলে এস।"

কীট্‌স্ রাজি।

টম যখন পায়ে পায়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছেন, তখন আর একজন ধীরে ধীরে কীট্‌সের হৃদয়ে প্রবেশ করছিল। সে একটি মেয়ে। কীট্‌সের মতো অবেগপ্রবণ তরুণ-কবির পক্ষে আরো অনেক আগেই প্রেমের অভিজ্ঞতা লাভ করা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু পরিবারে মেয়েদের সাহচর্যের সুযোগ ছিল না বলে অনাত্মীয়া মেয়েদের সঙ্গে সহজ হতে পারতেন না। হাসপাতালে রুগ্না মেয়েদের দেখেছেন ; সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশে মেয়েদের দেখবার সুযোগ কম ছিল। বন্ধু রেনল্ডসের পরিবারে এবং অন্য দু'-এক জায়গায় কীট্‌স্ মেয়েদের সামনে আসবার সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু ঘনিষ্ঠ হবার বাধাটা এসেছে তাঁর দিক থেকেই। কীট্‌স্ লম্বায় মাত্র পাঁচ ফুট। খর্বকায় হবার বেদনা সব সময় তাঁকে পীড়ন করত। এই হীনমন্যতার ভাব একটা চাপা নিঃশ্বাসের মতো প্রকাশ পেয়েছে তাঁর দু' একটি কবিতা ও চিঠিতে। তাঁর মনে হত কে ভালোবাসবে আমার মতো খাটো লোককে ? তাছাড়া কীটসের মনে হয়েছে যে, এমন মেয়ে তিনি একজনও দেখেননি যে তাঁর আদর্শ ও সৌন্দর্যলিপ্সার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন।

১৮১৮ সালে ত্রয়োবিংশ জন্মদিবসে কীট্‌স্ লিখলেন, "আমি কখনো বিয়ে করব না। সাঁ-সাঁ করে বয়ে চলেছে যে বাতাস, সে আমার স্ত্রী ; আর আকাশের তারাগুলি আমার সন্তান।"

কিন্তু এমনই পরিহাস যে, মাত্র কয়েকদিন পরে ব্রাউনের বাড়িতে এমন একটি মেয়ের



সঙ্গে পরিচয় হল যে তাঁর জীবনের বাকি তিনটে বছর সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। ফ্যানি ব্রন শুধু তাঁর জীবনে নয়, কাব্যেও প্রবেশ করল। ফ্যানির সঙ্গে দেখা হবার পর যা কিছু লিখেছেন কীট্‌স্, তার মধ্যে প্রত্যক্ষ কিংবা অপ্রত্যক্ষভাবে ফ্যানির প্রভাব পড়েছে।

ফ্যানি অষ্টাদশী তরুণী ; রূপবতী, লাবণ্যময়ী ; প্রাণ-প্রাচুর্যে উচ্ছল ; ভালোবাসে নাচ-গান-বাজনা আর বই-পড়া। সাজ-পোশাক সম্বন্ধে আছে দুর্বলতা। তার ব্যবহার মার্জিত এবং মর্যাদাবোধের পরিচায়ক। ফ্যানির এ-সব বৈশিষ্ট্য কীট্‌স্‌কে প্রথম আকৃষ্ট করতে পারেনি। প্রথম সাক্ষাতে যে জিনিসটি তাঁর চোখে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল তা ফ্যানির খর্বকায়ত্ব। মাথায় সে কীট্‌সের চেয়ে লম্বা হবে না। তাঁর অবচেতন মন বলে উঠল, এই মেয়েটি তো আমাকে খাটো বলে উপেক্ষা করতে পারবে না ! এই গোপন আশ্বাস কীট্‌স্‌কে সাহস দিল এগিয়ে যাবার। দেখা হবার কয়েকদিন পরে ফ্যানির বর্ণনা দিয়ে জর্জকে যে চিঠি লিখেছেন তাতে সমালোচনার সুর, কীট্‌স্ প্রথমেই বলেছেন, মেয়েটি মাথায় আমার মতো লম্বা।

দ্বিতীয়বার যখন সাক্ষাৎ হল তখন ফ্যানি কীট্‌স্‌কে পছন্দ না করবার ভান করল। কিন্তু দু'দিনেই সকল দ্বিধা গেল দূর হয়ে। একে অন্যকে হৃদয়ে গ্রহণ করল। কী চমৎকার করে কথা বলেন কীট্‌স্। শেক্সপীয়র, স্পেনসার, মলিয়ের, গ্রীক পুরাণের কাহিনী তন্ময় হয়ে শোনে ফ্যানি। যেন গ্রীক ভাস্করের হাতে গড়া অপূর্ব সুন্দর মুখ ! ক্ষণে ক্ষণে মুখের রূপ বদলায় অনুভূতি বদলের সঙ্গে সঙ্গে। যেন মঞ্চের পটপরিবর্তন। এমন ব্যঞ্জনাময়, স্বচ্ছ মুখ সে আর দেখেনি, যে মুখে হৃদয় এমন করে প্রতিফলিত হয়।

টমকে কেন্দ্রকরে দু'জনের মধ্যে সহানুভূতির সেতু গড়ে উঠল। টমের মতো ফ্যানির ভাইও ক্ষয় রোগী। কীট্‌সের মা মারা গেছেন যক্ষ্মায়, ফ্যানির বাবার জীবনান্ত হয়েছে সেই রোগে। কীট্‌সের মা-বাবা কেউ নেই, ছোট ভাইয়ের অসুখে এবং অর্থাভাবে পীড়িত—সুতরাং সহজেই তিনি নারী-হৃদয়ের মমতা আকর্ষণ করলেন। ফ্যানির মা-ও তাঁকে স্নেহ করতেন এই জন্য। সহানুভূতি প্রেমে পরিণত হতে দেরি হল না। ১৮১৮ সালের ২৫শে ডিসেম্বর কীট্‌স্ ফ্যানিকে তাঁর জীবনসঙ্গিনী হবার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। ফ্যানি সানন্দে সবান্তঃকরণে গ্রহণ করল সেই প্রস্তাব। সেদিন রাত্রিতে শোবার আগে ফ্যানি তার দিনলিপিতে লিখল : "আজকের দিনটা আমার জীবনের সবচেয়ে সুখের দিন।"

বাগ্‌দানের কথা খুব ঘনিষ্ঠ কয়েক জন ছাড়া আর কেউ জানল না। ফ্যানি তখনো সাবালিকা নয় ; সুতরাং মা'র অনুমতি চাই বিয়েতে। শ্রীমতী ব্রন উপদেশ দিলেন কীট্‌স্ উপার্জনশীল না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে। ফ্যানি সত্যি ভালোবেসেছিল কীট্‌স্‌কে ; তাঁর প্রতিভার দীপ্তিতে মুগ্ধ হয়েছিল ফ্যানি। তা না হলে স্বামীত্বে বরণ করবার মত কোনো সাংসারিক গুণ কীটসের ছিল না। অমন লাভের পথ ডাক্তারি ছেড়ে আরম্ভ করেছেন কবিতা লিখতে ; কবিখ্যাতি লাভ করবেন এমন আশাও নেই ; এপর্যন্ত পেয়েছেন বিদ্রূপ। নিজের ব্যয় বহন করতেও এখনো সমর্থ হননি। কবে হবেন তাও অনিশ্চিত। তাঁর পরিবারে আছে ক্ষয়রোগের ইতিহাস ; কীট্‌সের নিজের স্বাস্থ্যও ভালো নয়, বলা যায় না কখন কী হয়। প্রেমের দেবতা নেহাৎ অন্ধ না হলে কোন মেয়ে এমন ছেলের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে কেন চাইবে ?

ফ্যানিরা কখনো ব্রাউনের বাড়ি, কখনো ডিল্‌কের বাড়ি কখনো বা পাশের অন্য কোনো বাড়িতে থাকে। কীট্‌স্ আর ফ্যানি সর্বদা কাছাকাছি থাকেন ; ইচ্ছা হলেই পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারেন। দু'জনে বেড়াতে যান মাঠে। সুন্দর কিছু চোখে পড়লে কীটস ফ্যানিকে



Scanned with CamScanner

দেখান ; আর মাঝে মাঝে শোনান নিজের লেখা কবিতা থেকে কয়েকটা লাইন। প্রথম প্রথম এমন হল যে ফ্যানির চোখ, মুখ, ঠোঁটের ভঙ্গি, কণ্ঠস্বর—তার সব কিছু কীট্‌সের চেতনা আচ্ছন্ন করে দিল। কবিতা কোথায় হারিয়ে গেল ; ফ্যানি ছাড়া আর কেউ নেই, আর কিছু নেই। দিন পার হয়ে যায়, হৃদয় পরিপূর্ণ, অথচ কলমের মুখে ছন্দোবদ্ধ একটাও কথা আসে না। একবার ভয় হল কবিতার মূল্যে বুঝি ফ্যানিকে পেতে হবে। কিন্তু সে ভয় দূর হল কিছুদিন পরেই। কবিতার বান এল। কীট্‌সের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির অধিকাংশ এই সময় লেখা। ফ্যানি অদৃশ্য থেকে এদের প্রেরণা যুগিয়েছে, সহায়তা করেছে এদের রসঘন, আবেগমধুর করতে।

বাগদানের ছ'মাস পরেই কীট্‌স্ গলার অসুখে পড়লেন এবং সেই সঙ্গে তীব্র হয়ে দেখা দিল আর্থিক অনটন। একবার মনে হল ওষুধের দোকানে চাকরির চেষ্ট করে দেখবেন। কিন্তু ব্রাউন নিষেধ করলেন। বললেন, "আরো লিখতে থাকো,—এ পথেই তোমার উন্নতি।" কীট্‌স্ একবার ভাবেন ফ্যানিকে মুক্তি দেব। আমার অন্ধকার ভবিষ্যতের সঙ্গে তার জীবনকে কেন জড়িয়ে রাখব ? কিন্তু পরমুহূর্তেই খেয়াল হয় ফ্যানি তাঁর সত্তার অচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছে, তাকে মুক্তি দেবার কথা তো আর ওঠে না ! জুন মাসের শেষের দিকে তিনি যাত্রা করলেন আইল অব ওয়াইটের পথে। ফ্যানিকে বলে গেলেন, অর্থ উপার্জনের ব্যবস্থা না করে আর ফিরবেন না।

পাশের ঘরে পাশের বাড়িতে, অথবা দূরে, —যেখানেই থাক, প্রত্যহ চিঠির বিনিময় চলত দু'জনের মধ্যে। মুখের কথায় সব প্রকাশ করা যায় না। কীট্‌সের আবেগপূর্ণ চিঠিগুলি ইংরেজি সাহিত্যের সম্পদ। এর মধ্যে রূপ পেয়েছে তাঁর বিচিত্র মনোভঙ্গি—প্রেম, সন্দেহ, ঈর্ষা, আশা ও নিরাশা।

জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে কীট্‌সের চিঠি পেল ফ্যানি। লিখেছেন : "নিজেকে প্রশ্ন করে দেখ, স্বাধীনতা হরণ করে এমনিভাবে আমাকে বন্দী করে রাখা কি তোমার পক্ষে নিষ্ঠুর কাজ হয়নি ? আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য যে চিঠি লিখবে তা যেন একমাত্রা আফিঙের মতো মধুর হয়, যা পড়ে আমার মন নেশায় মশগুল হয়ে যাবে। তুমি মিষ্টি কথাগুলি লিখে তাদের উপর চুমু বুলিয়ে দিও। আমি তাদের স্পর্শ করে সান্ত্বনা পাবো···। আমার অনেক সময় মনে হয় তিনটি সূর্যকরোজ্জ্বল দিনের পরমায়ু নিয়ে যদি প্রজাপতি হতাম তাহলে তিনটিদিনে আমরা পঞ্চাশটি সাধারণ বৎসরের চেয়ে অনেক বেশি আনন্দ সঞ্চয় করতে পারতাম।

পঁচিশে জুলাই রাত্রিতে কীট্‌স্ আবার লিখেছেন : "আমার মনে শুধু দু'টি ভাবনা। তোমার লাবণ্যসিক্ত সৌন্দর্য এবং আমার মৃত্যুর মুহূর্ত। হায়, এই দু'টিকে যদি একই সঙ্গে পেতাম !"

কিন্তু আরও অনেক ভাবনা ছিল কীট্‌সের। ১৮১৯ সালটা তাঁর পক্ষে দুর্বৎসর। টমের কথা সব সময় মনে পড়ে। আমেরিকায় জর্জ কপর্দকহীন হয়ে পড়েছে। কবিতার কঠোর সমালোচনা ক্ষত-বিক্ষত করেছে তাঁর মন। কিন্তু সবচেয়ে বড় দুঃখ পেয়েছেন ফ্যানিকে ভালোবেসে। ফ্যানি সাজ-পোশাক ভালোবাসে ; একটু চটুল রসিকতা, নাচ, গান, হল্লার প্রতি প্রলোভন সে বয়সে স্বাভাবিক। কীট্‌সের দেহ অপটু ; ফ্যানিকে নাচের আসরে নিয়ে যেতে পারেন না ; বিকেলে প্রায় বিছানায় শুয়ে কাটান, বেড়াতে নিয়ে যাবেন কেমন করে ? কীট্‌সের প্রেম সর্বগ্রাসী ; তাঁর ফ্যানিকে সর্বক্ষণের জন্য চাই। তার প্রতিটি কথা, হাসির টুকরো, লাবণ্যের হিল্লোল একমাত্র তিনি উপভোগ করবেন, আর কেউ নয়। ফ্যানি এ যুক্তি



বোঝে না। কীট্‌সকে ভালোবেসেছে বলে অন্য সকলের বন্ধুত্ব ত্যাগ করবে কেন ? কীট্‌স্ নিঃসঙ্গ রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে ঈর্ষায় পুড়তে থাকেন। তাঁর চোখের সামনে দিয়ে সেজেগুজে ফ্যানি বেড়াতে যায়, যায় নাচের আসরে। কীট্‌স্ কল্পনা করেন কার সঙ্গে ফ্যানি নাচছে, কার সঙ্গে হেসে কথা কইছে। অক্ষম ও দুর্বল প্রেম বড় সাংঘাতিক। গ্লানিতে কীট্‌সের হৃদয় পূর্ণ হয়ে যায়। ফ্যানির মধ্যে তিনি আদর্শ নারীর গুণ আরোপ করেছিলেন। ভেবেছিলেন, সে তাঁর জুলিয়েট। কিন্তু হায়, দেখা গেল তাঁর মানসী আর পাঁচজন মেয়ের মতোই সাধারণ। সাধারণ বলে যদি উপেক্ষা করবার শক্তি পেতেন তাহলেও রক্ষা ছিল। কখনো সাধারণ, কখনো অসাধারণ মনে হয় ; কিন্তু প্রবল আকর্ষণ বিন্দুমাত্র শিথিল হয় না। ফ্যানির উপরে যে ক'টি কবিতা আছে সেগুলিতে প্রকাশ পেয়েছে কীট্‌সের রক্তাক্ত আর্তনাদ। কীট্‌স্ বলছেন : "আজ আমি ডানাভাঙ্গা পাখির মতো তোমার পায়ের কাছে পড়ে আছি। হয় দয়া করো, না হয় ফিরিয়ে দাও আমার ওড়বার স্বাধীনতা। তোমার প্রেমের এককণাও আমার কাছ থেকে সরিয়ে রেখো না ; তাহলে আমি মরে যাব।"

কীট্‌স্ আবার লণ্ডনে ফিরে এসেছেন। আসবার আগে ফ্যানির সঙ্গে তার একটু কলহ হয়েছে, যার মূলে ছিল কীট্‌সের ঈর্ষা। ১৮২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। তেসরা তারিখ লণ্ডনের বাইরে কীট্‌স্ বেড়াতে গিয়েছিলেন। ফিরলেন সন্ধ্যার পরে ডাক-গাড়ির গাড়োয়ানের পাশে বসে। সঙ্গে উপযুক্ত গরম পোশাক ছিল না। খোলা হাওয়ায় ঠাণ্ডা লেগে হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দিল। বাসায় যখন ফিরলেন তখন প্রবল জ্বর এসে গেছে। তাড়াতাড়ি বিছানায় শুতে গেলেন। হঠাৎ একটা কাশি এল, আর সঙ্গে সঙ্গে মুখ ভরে গেল লবণাক্ত স্বাদে। ব্রাউনকে ডেকে বললেন বাতি নিয়ে আসতে ; সাদা বালিশ রক্তে লাল হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে থেকে কীট্‌স্ ধীরে ধীরে বললেন, "এই রক্তের রঙ আমি চিনি। এ রক্ত এসেছে ধমনী থেকে—আমার মৃত্যুর শমন ; মৃত্যু এসেছে আমার।"

ব্রাউন ডাক্তার ডাকলেন। সে যুগে বিশ্বাস ছিল দেহে রক্তাধিক্য হলে এবং রক্ত দূষিত হলে রক্তবমি হয়। সুতরাং একমাত্র চিকিৎসা হল রক্তমোক্ষণ। ডাক্তার এসে কীট্‌সের হাতের শিরা কেটে রক্তমোক্ষণের ব্যবস্থা করল। ছ মাস ধরে একটি দিনও কীট্‌সের শান্তিতে কাটেনি। ঠিক ছ' মাস আগে অভিমান করে ফ্যানির কাছ থেকে দূরে সরে এসেছেন। কীট্‌স্ ফ্যানিকে লিখলেন : "বিশ্বাস করো, আমার এমন কোনো কাজ নেই কথা নেই চিন্তা নেই যার মূলে তুমি নেই। বিষামৃত তোমার ভালোবাসা। দুঃখ যত পাই তোমাকে নিয়ে, আনন্দও তার চেয়ে কম নয়। সেদিন রাত্রিতে যখন ফুসফুস থেকে রক্ত উঠে আসছিল, যখন দমবন্ধ হয়ে ছটফট করছিলাম, মনে হয়েছিল মৃত্যু এসে শিয়রে দাঁড়িয়েছে, সেই চরম মুহূর্তে আমার মনের চেতন আকাশে একমাত্র ছিলে তুমি !"

এ রোগ ছোঁয়াচে তখন সে ধারণা ছিল না। ফ্যানি প্রায় প্রত্যেক দিন একবার করে দেখে যেত। কীট্‌স্ দিন দিন যত অপটু হতে লাগলেন তাঁর ঈর্ষার জ্বালা ততই বাড়তে লাগল। কল্পনার চোখে দেখতে পান ফ্যানি ব্রাউনের সঙ্গে ফ্লার্ট করছে, নাচছে, বেড়াচ্ছে। কঠোর কথা বলেন ফ্যানিকে, অনেক সময় অপমানজনক ইঙ্গিত। আবার হয়ত ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। ফ্যানি তাঁর অবস্থা বুঝে সব সয়ে যায়। সমস্ত আশা নির্মূল হয়ে যাবার পরও বেঁচে থাকার মতো বিড়ম্বনো আর কী আছে ? কীট্‌স্ অনুভব করেন ধীরে ধীরে নিশ্চিতরূপে তিনি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছেন। অথচ তাঁর চোখের সামনেই ফ্যানি ঘুরে বেড়ায় জীবনের প্রতীক হয়ে। সেই জীবনকে তো তিনি আঁকড়ে ধরতে গিয়েছিলেন, কিন্তু মারাত্মক ব্যাধি



Scanned with CamScanner

এসে বাদ সাধল। যেন ক্ষুধার্তের একটিমাত্র গ্রাস কেড়ে নিয়েছে কোনো দস্যু। শুয়ে শুয়ে অলস মনে অক্ষেপ করেন, সুস্থ থাকতে যদি ফ্যানিকে বিয়ে করতেন তাহলে হয়ত তিনি বেঁচে যেতেন, ফ্যানির প্রাণপ্রাচুর্যের সংস্পর্শ হয়ত সঞ্জীবনীর কাজ করত। আর একটা দুঃখ ছিল কীট্‌সের : এমন কিছুই রেখে যেতে পারলাম না যার জন্য মৃত্যুর পর বন্ধুরা আমাকে মনে রাখবে।

একদিন কীট্‌স্ বাগ্‌দানের আংটি খুলে দিয়ে ফ্যানিকে বললেন, "তোমাকে মুক্তি দিলাম। আর আমার ভালো হবার আশা নেই। কী হবে অপেক্ষা করে ?"

ফ্যানি বলল, "ও, আমাকে ভুলতে চাও বুঝি ? আমি অপেক্ষা করব তুমি সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত।"

কীট্‌স্ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, "হাঁ, তুমি অপেক্ষা করতে পারো। নাচ, গান, হাসি তোমার জীবন পূর্ণ করে দেবে। কিন্তু আমার সামনে মৃত্যু,বর্তমানও শূন্য। আমি অপেক্ষা করব কী নিয়ে ? তুমি আমার একান্ত কামনার বস্তু···যে ঘরে তুমি নেই সেখানকার নিঃশ্বাস আমার কাছে অস্বাস্থ্যকর। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারি না ; কিন্তু আমি চাই সাধ্বী তোমাকে, ধর্মভীরু তোমাকে।"

জুন মাসে আবার শুরু হল রক্তবমন। ডাক্তার পূর্বের মতোই রক্ত বের করে দিতে লাগল। পথ্য একেবারে কমিয়ে দিল, প্রায় উপবাস। উপবাস দিলেই রক্তের পরিমাণ কমবে। ডাক্তার পরামর্শ দিল ইতালি যেতে। শীতের সময় ইংলণ্ডে থাকলে রক্ষা নেই।

কীট্‌সের দেহ ক্রমশ শক্তিহীন হয়ে পড়ছে। সেই সঙ্গে মনও হয়েছে দুর্বল। শুয়ে শুয়ে কেবল রোমন্থন করেন সেই কয়েকটি দিনের সুখ-স্মৃতি; যখন ফ্যানির সঙ্গে মাঠের পথে ঘুরে বেড়াবার সুযোগ পেয়েছিলেন। এখন তিনি ফ্যানির সঙ্গে দেখা করতে ভয় পান, কারণ বিচ্ছেদের বেদনা সইবার শক্তি আর নেই। এই সময় কীট্‌স্ একটা চিঠিতে লিখলেন : "ক্ষমতা থাকলে এখন একটি কবিতা লিখতাম ; তার নায়ক আমার মতো রুগ্ন, আর নায়িকা তোমার মতো সুস্থ ও জীবন বিলাসী। আমার মনের যে অবস্থা সে অবস্থায় হ্যামলেট ওফেলিয়াকে বলেছিল, Go to a nunnery, go, go ! কী হয়েছে আমার, সবাইকে ঘৃণা করি। ভবিষ্যতের কাঁটা-পথ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। ইতালি বা যেখানেই যাই না কেন কল্পনায় দেখব ব্রাউন তোমার সঙ্গী ; আমার মনের শান্তিটুকু তোমরা কেড়ে নেবে। শান্তি পাবো শুধু কবরে গিয়ে।"

মাস খানেকের মধ্যে কীট্‌সকে ইতালি রওনা হতে হবে। বন্ধুরা সব ব্যবস্থা করেছে। ফ্যানি বাগ্‌দানের পর থেকে দীর্ঘ সতের মাস সয়েছে অনেক অনিশ্চয়তা। কীট্‌স্ চলে যাবার আগে তাদের বিয়েটা হয়ে যাক, এই সে চায়। তার মা-ও মত দিলেন ; ভাবলেন, মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে তিনি যাবেন ইতালিতে। সেবা করে সুস্থ করে তুলবেন কীট্‌সকে। কিন্তু আবার কী মনে করে তিনি আপত্তি করলেন। কীট্‌স্‌ও ফ্যানির প্রস্তাবে সম্মতি দিতে পারলেন না।

ইংলণ্ডে শেষ একটা মাস কীট্‌সের বড় শান্তিতে কাটল। এই এক মাস তিনি ছিলেন ফ্যানিদের বাড়ি। ফ্যানি আর তার মা সেবায় যত্নে স্নেহে কীট্‌সের বুভুক্ষু জীবন পূর্ণ করে দিয়েছিল। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এই ক'দিনের মধুর স্মৃতি ছিল তাঁর একমাত্র সম্বল। ১৮২০ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর কীট্‌স্ ফ্যানির কাছ থেকে চির-বিদায় গ্রহণ করলেন। হৃদয়ে প্রেম এবং ফুসফুসে মৃত্যু নিয়ে যাত্রা করলেন ইতালির উদ্দেশ্যে। একটা ভীরু আশা ভরসা দিচ্ছিল, গরম আবহাওয়ায় সুস্থ হয়ে আবার ফিরে আসবেন ফ্যানির কাছে। যাবার আগে



ফ্যানি কীট্‌সের বাক্স গুছিয়ে দিল ; কীট্‌স্ তাঁর প্রিয় বইগুলি ফ্যানির হাতে তুলে দিলেন, এবং স্মারক হিসাবে দিলেন সেভার্নের আঁকা তাঁর ছবি। ফ্যানি কীট্‌সকে উপহার দিল পকেট-বই, ছুরি, আর মাথার একগুচ্ছ চুল এবং মনের জোর অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য একটি কবচ। তা ছাড়া কীট্‌সের টুপিতে ফ্যানি লাগিয়ে দিল সিল্কের লাইনিং। সেদিনকার দিনলিপিতে ফ্যানি শুধু লিখতে পেরেছে : "আজ মিস্টার কীট্‌স্ হ্যাম্পস্টেড থেকে চলে গেলেন।"

যাত্রার আয়োজন সব সম্পূর্ণ ; কিন্তু সঙ্গে যাবে কে ? একা তো আর যেতে পারেন না ! কীট্‌সের নীরব-ভক্ত মুখচোরা তরুণ শিল্পী সেভার্ন রাজি হল। বাড়ি থেকে বেরুবার মুখে সেভার্ন বাবাকে বলল ট্রাঙ্কটা একটু ধরে নামিয়ে দিতে। নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে একটা ক্ষয়রোগীর পরিচর্যার জন্য বিদেশে যাচ্ছে—এই নির্বুদ্ধিতায় ছেলের উপর বাবা আগুন হয়ে ছিলেন। ট্রাঙ্ক ধরবার অনুরোধে ক্রোধে ফেটে পড়লেন। অতর্কিতে সেভার্নকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেন মেঝেতে, কপাল কেটে গেল। সেভার্ন যখন জাহাজঘাটে উপস্থিত হল তখনও কপালের দাগ মিলায়নি, কিন্তু মুখ হাসিতে উৎফুল্ল। কীটসের কাজে লাগতে পারায় নিজেকে কৃতার্থ মনে করছে।

'মেরিয়া ক্রাউথার' মালটানা জাহাজ। তাতে একটিমাত্র কেবিন। সেই জাহাজে কীট্‌স ইতালি যাত্রা করলেন। জাহাজের দিনগুলি তাঁর পক্ষে একটুও স্বস্তিতে কাটেনি। তাঁর কেবিনের সহযাত্রী ছিল এক যক্ষ্মা রোগিনী। মেয়েটির খোলা হাওয়া না হলে চলে না, পোর্ট-হোল বন্ধ করলে সে মূর্ছিত হয়ে পড়ে। আবার পোর্ট-হোল খুললে ঠাণ্ডা বাতাসে কীট্‌স্ প্রবল কাশিতে পীড়িত হয়ে পড়েন। কেবলই খোলা আর বন্ধ করা চলত সারাদিন। এমনি করে ছ' সপ্তাহের পথ অতিক্রম করতে হয়েছিল।

জাহাজে বসে কীট্‌স ফ্যানিকে যে চিঠিগুলি লিখেছিলেন সেগুলি থাকলে কীট্‌সের তখনকার মনোভাব বোঝা যেত। যত দুঃখই ফ্যানির কাছ থেকে পেয়ে থাকুন, সর্বদা তাঁর কাছে কাছে থাকার আনন্দটা আজ বুঝতে পেরেছেন। ফিরে আসবার আশাটা ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসছে, ধীরে ধীরে প্রবেশ করছেন মৃত্যুর কালো গহ্বরে ; সৈন্যরা শত্রু পক্ষের কামান অধিকার করবার জন্য যেভাবে আক্রমণ করে, ঠিক তেমনি। কীট্‌সের মৃত্যুর পর ভিক্টোরীয় যুগের নীতিবাগীশ এক ভদ্রলোকের হাতে ফ্যানিকে লেখা চিঠিগুলি পড়েছিল। সে চিঠির ভাষা এমন জীবন্ত, আকাঙ্ক্ষায় এমন জ্বলন্ত যে পড়তে পড়তে মনে হয় যেন কানের কাছে কে কথা বলছে। চিঠি তো নয়, যেন সবাক গ্রামোফোন রেকর্ড। ভদ্রলোক বললেন, এ চিঠির কথাগুলি নিভৃত শয়নকক্ষে বসে স্বামী স্ত্রীর কানে বলতে পারে। এগুলো সকলের হাতে তুলে দিলে নীতি যাবে রসাতলে। তাই তিনি অমূল্য চিঠিগুলি চিমনির আগুনে আহুতি দিলেন।

ইংলণ্ড থেকে যাত্রার পূর্বে কীট্‌স্ একটি চিঠিতে লিখেছিলেন : "আজ যে দুঃখ পাচ্ছি মৃত্যুর সঙ্গে তা-ও শেষ হয়ে যাবে। শূন্যতার চেয়ে বেদনাও ভালো। তোমরা ভাবো ফ্যানির অনেক দোষ আছে ; কিন্তু আমার কথা মনে করে তা ভুলে যেও। আমি যেন স্বপ্নের মতো দেখতে পাই ফ্যানি ক্রমাগত আমার কাছ থেকে দূরে সরে সরে মিলিয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, পরলোক বলে কিছু আছে ? মৃত্যুর পরে সেখানে গিয়ে কি দেখব যে আজকের বেদনা শুধুই স্বপ্ন ? পরলোক নিশ্চয়ই আছে, তা না হলে আমাদের কি সৃষ্টি হয়েছে শুধু দুঃখ ভোগের জন্য ?"

মৃত্যু যত নিকটে আসছে কীট্‌স্ ততই মৃত্যুর অতীত কোনো বস্তুকে আঁকড়ে ধরবার



Scanned with CamScanner

চেষ্টা করছেন। সে হোক পরলোক, হোক আকাশের ধ্রুব তারা। সমুদ্রের উপর দিয়ে যেতে যেতে প্রত্যহ রাত্রিতে ধ্রুবতারা কীট্‌সের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নিজের আসন্ন মৃত্যুর সঙ্গে ধ্রুবতারার চিরস্থায়িত্ব তুলনা করতে ভালো লাগে।

ধ্রুবতারার উপর একটা কবিতার খসড়া কীট্‌সের আগেই ছিল। জাহাজে বসে খসড়াটা মার্জনা করলেন। এটাই কীট্‌সের শেষ কবিতা।

ছয় সপ্তাহ পরে ২১শে অক্টোবর জাহাজ এসে নোঙর করল নেপলস্ বন্দরে। ভোরবেলা, সূর্য উঠছে সমুদ্রের উপর দিয়ে ; সমুদ্র তীরের গাছপালা ও বাড়িঘরের উপরে সোনালি আবির কে ছড়িয়ে দিয়েছে। গরম দেশের এমন উজ্জ্বল বর্ণাঢ্য সূর্যোদয় কীট্‌সকে মুগ্ধ করল। কিন্তু মনের অনুভূতি কবিতা হয়ে ফুটল না, ফোটাতে পারলেন না। রোগ শুধু তাঁর দেহ জীর্ণ করেনি, কাব্য-প্রতিভাও হরণ করেছে।

নেপলস্ থেকে ব্রাউনকে কীট্‌স্ লিখলেন : "শরীর যখন সুস্থ ছিল তখন যদি ফ্যানিকে পেতাম তাহলে আজ হয়ত ভালো থাকতাম। মৃত্যু আমি সইতে পারি, কিন্তু সইতে পারি না ওর বিচ্ছেদ। হায় ঈশ্বর ! ঈশ্বর ! ঈশ্বর ! আমার বাক্সে ফ্যানির স্মারক-জিনিসগুলি বল্লমের মতো হৃদয় বিদ্ধ করে। ফ্যানি যে টুপিতে সিল্কের লাইনিং পরিয়ে দিয়েছে তা আমার মাথা পুড়িয়ে দেয়। ওর সম্বন্ধে আমার কল্পনা কী ভয়ঙ্কর সজীব ! ফ্যানিকে যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, স্পষ্ট তার কণ্ঠস্বর কানে আসছে। পৃথিবীতে এমন কোনো আকর্ষণের বস্তু নেই যা মুহূর্তের জন্যও আমার মন ফ্যানির উপর থেকে সরাতে পারে। হায়, ও যেখানে থাকে তার কাছাকাছি কোথাও যদি আমাকে কবর দেওয়া হত ! আমি ওকে চিঠি দিতে, ওর কাছ থেকে চিঠি পেতে ভয় পাই ; ফ্যানির হাতের লেখা চোখে পড়লে আমার বুক ভেঙে যাবে, কেউ যদি ওর নাম উচ্চারণ করে, কোথাও যদি ওর নাম দেখতে পাই তাহলে আমি সইতে পারব না। ব্রাউন, আমি কী করতে পারি ? কোথায় সান্ত্বনা পাবো ? স্বস্তি কোথায় আছে ? আমার ভালো হবার আশা থাকলেও এই প্রেম আমাকে মারত।...তুমি আমাকে যে চিঠি লিখবে তাতে ওর সংবাদ দিও। যদি ও ভালো থাকে সুখে থাকে তাহলে শুধু + চিহ্ন দেবে ; আর যদি—

ব্রাউন, আমার কথা মনে করে চিরদিন ওর পক্ষ সমর্থন কোরো। আমি ওকে চিঠি লিখতে পারি না, কিন্তু আমি চাই যে ও জানুক আমি ভুলিনি। হায় ব্রাউন আমার বুকে আগুন জ্বলছে। আমি অবাক হয়ে যাই যে মানুষের হৃদয় এত দুঃখ সইতেপারে ! আমার জন্ম কি হয়েছিল এই দুঃখ সইবার জন্যই ? ঈশ্বর তোমাদের সকলের মঙ্গল করুন !"

কীট্‌স্ নেপলসে পৌঁছবার পর ইংলণ্ডের ঠিকানায় আমেরিকা থেকে জর্জ চিঠি লিখল : "শ্রীমতী ব্রন তোমাকে যেরূপ যত্ন করেছেন তার জন্য তাঁকে আমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।" তার পরে পরামর্শ দিচ্ছে : "বিয়ে করলে এসব রোগে হয়ত উপকার হতে পারে।"

কীট্‌স্ আর শেলী—আপনা থেকেই দু'টো নাম একসঙ্গে মনে পড়ে যায়। কীট্‌স্ সৌন্দর্যের উপাসক, শেলী মুক্তির। অকালমৃত্যু দুজনকেই করেছে চির-তরুণ। কীট্‌সকে প্রতিদ্বন্দ্বী বলে কাব্যের আসরে অভ্যর্থনা করেছিলেন শেলী। সমুদ্র থেকে শেলীর মৃতদেহ তোলবার পর তাঁর এক পকেটে পাওয়া গেল শেক্সপীয়র, অন্য পকেটে কীট্‌সের কবিতা। প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও উদার মনে শেলী কীট্‌সকে বরণ করে নিয়েছিলেন। কীট্‌সের মৃত্যুর পরে শেলী যে শোকগীতি রচনা করেছেন আজও তা ইংরেজি সাহিত্যে অনন্য হয়ে আছে।

শেলী তখন পিসায় থাকেন। কীট্‌সকে আমন্ত্রণ করলেন, বললেন, "তুমি এস, পরিচর্যা করে সুস্থ করে তুলব তোমাকে।" কিন্তু সে যুগের ক্ষয়রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ক্লার্ক থাকেন



রোমে। তাঁকে দিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে। সুতরাং শেলীর আমন্ত্রণ অন্তর স্পর্শ করলেও কীট্‌স্‌কে যেতে হল রোম।

কীট্‌স্ ও সেভার্ন দু'খানা ঘর ভাড়া করলেন। ডাক্তার ক্লার্ক চিকিৎসা করেন। এটা যে ক্ষয়রোগ সে সম্বন্ধে এখনো তিনি নিঃসন্দেহ নন। তাঁর ধারণা আসল রোগটা পাকস্থলীকে কেন্দ্র করে। কিন্তু শীত আসতেই রক্ত পড়া শুরু হল। আবার সেই পুরনো ব্যবস্থা দেওয়া হল রক্তমোক্ষণের। যতবার রক্তবমি তত বার হাতের শিরা ফুঁড়ে রক্ত বের করা হয়। আর পথ্য যা দেওয়া হল তা উপবাসের নামান্তর। কীট্‌স্ অভিযোগ করেছেন যে, এই খাদ্য খেয়ে একটা ইঁদুরও মরে যাবে। সেভার্ন কখনো ডাক্তারকে লুকিয়ে অতিরিক্ত খাবার দিত। কিন্তু অধিকাংশ দিনই থাকতে হত আধপেটা খেয়ে। তার উপর ডাক্তারের কাছ থেকে পাওয়া গেল এক নতুন ব্যবস্থা। রোজ সকালে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে হবে কীট্‌সকে। সুস্থ হবার আশায় সেই দুর্বল শরীরেও কীট্‌স্ কিছুদিন এই নির্দেশ পালন করেছেন।

ক্রমে কীট্‌স্ শয্যালগ্ন হয়ে পড়লেন। ছোট এক ফালি ঘর ; জেলখানার কুঠরির মতো। সেইটুকু তাঁর জগৎ—বাইরের পৃথিবী হারিয়ে গেল। যে জগতকে চিনতেন সেই হারানো জগতে আলোক-স্তম্ভের মতো একমাত্র দাঁড়িয়ে আছে ফ্যানি। প্রতি মুহূর্তে মনে পড়ে, কিন্তু মুখে নাম আনেন না। অনিশ্চিত আশায় দূরে,অনাত্মীয় জায়গায় মৃত্যুর চেয়ে হ্যাম্পস্টেডে ফ্যানির দু'ফোঁটা চোখের জলের তিলক পরে কবরে যাওয়া কত ভালো ছিল ! আসবার আগে কয়েকদিন ফ্যানির সেবা পেয়েছেন ; সে কী সুখ, কী তৃপ্তি সারাক্ষণ তাঁর রোগজর্জর দেহ সেই স্পর্শটুকুর জন্য লালায়িত হয়ে থাকে।

এখানে আছে সেভার্ন। কে বললে আত্মীয় নেই ? ছায়ার মতো আছে তাঁর বিছানার পাশে। নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাবে না, আত্মবিলোপ করে দিয়েছে বন্ধুর জন্য। রাতের পর রাত সে কীট্‌সের মাথা কোলে করে রয়েছে ; দিনে ঘর ঝাঁট দিয়েছে, পথ্য তৈরি করেছে, বুকে ব্যথা উঠলে স্নেহস্পর্শ বুলিয়ে দিয়েছে। হয়ত উনুনে আঁচ দিতে গেছে, আগুন ধরে না, যত ফুঁ দেয় কেবল ধোঁয়া বাড়ে ; ওদিকে কীট্‌স্ ডাকছেন—হয়ত খিদে পেয়েছে, কিংবা রক্ত উঠেছে—পিকদানিটা এগিয়ে দিতে হবে। হাতে যখন একটিও পয়সা থাকে না তখন টাকার যোগাড় সেভার্নকেই করতে হয় যে করে হোক। না হলে এই বিদেশে কীটস্‌কে উপোস করে থাকতে হবে।

মাঝে মাঝে প্রাণান্তকর যন্ত্রণায় কীট্‌সের শীর্ণ দেহ আকুঞ্চিত হয়ে যায়। "ভগবান, শেষ করে দাও, শেষ করে দাও, আর কত কাল !" আত্মহত্যা করা যেতে পারে সেভার্ন এমন জিনিসগুলি কীট্‌সের নাগালের বাইরে সরিয়ে রাখে। ইংলণ্ড থেকে কীট্‌সের নির্দেশে এক বোতল আফিঙের আরক এনেছিল সঙ্গে করে। অসহ্য যন্ত্রণা উঠলে কীট্‌স্ চিৎকার করে ওঠেন : "দাও, সেই বোতলটা আমাকে দাও।"

তারপর সেভার্নের নিশ্চল মূর্তির দিকে চেয়ে আবার বলেন, "শুধু আমার জন্য নয়, তোমার জীবনের কি মূল্য নেই ? আমি যত দিন বাঁচব ততদিন তোমার তো মুক্তি নেই !"

অসহ্য যন্ত্রণার মুহূর্তগুলিতে যখন জীবনের টানাপোড়েন চলে তখন ফ্যানির শেষ উপহার কবচটিকে কীট্‌স্ দৃঢ়মুষ্টিতে আঁকড়ে ধরেন,—যেন এটাই তাঁর একমাত্র আশ্রয়। একদিন ফ্যানির চিঠি এল। খামের উপর হাতের লেখা দেখে কীট্‌স্ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। সে উত্তেজনার জের সাত দিনেও মিটল না। সেভার্নকে বললেন, "এ চিঠি আমি পড়তে পারব না ; আমার মৃত্যুর পর কবরে দিয়ে দিও।"

ওদিকে হ্যাম্পস্টেডে কীট্‌সের কাছ থেকে তাঁর চিঠির উত্তর প্রত্যাশা করে ফ্যানি ক্লান্ত



Scanned with CamScanner

হয়ে পড়ে। সেভার্ন ব্রাউনকে নিয়মিত চিঠি দেয়। সেই চিঠি থেকে যা একটু সংবাদ জানতে পারে।

যেদিন যন্ত্রণা থাকে না, শরীর একটু ভালো বোধ করেন, সেদিন কীট্‌স্ বই পড়েন, সেভার্ন জানালার কাছে বসে ছবি আঁকে। পরলোক সম্বন্ধে আগ্রহ হয়েছে কীট্‌সের। সেই সম্বন্ধে বই পড়তে চান। এ জীবনে যাকে পাওয়া গেল না, পরজন্মে তাকে পাওয়া যাবে কিনা—এই কথাটা হয়ত জানতে উৎসুক। নিজের চেষ্টায় কীট্‌স্ একটু ইতালিয়ান শিখেছেন। একদিন ফিলিপ্পোর কয়েক লাইন পড়বার পরই পেলেন :

Wretched me! There is no solace
left for me
Except weeping, and weeping
is a crime.

হায়, কি নিষ্ঠুর সত্য! তাঁর জীবনে কান্না ছাড়া সত্যি আর কিছু নেই। কীট্‌স্ বইটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

৩০শে নভেম্বর কীট্‌স্ শেষ চিঠি লিখলেন ব্রাউনকে : "সব সময় মনে হয় আমার আসল জীবনের মৃত্যু হয়েছে; এখন যেন মৃত্যু পরবর্তী জীবনযাপন করছি।"

এরপরে দশ সপ্তাহ যাবৎ কীট্‌সের শীর্ণ দেহে জীবনমৃত্যুর নিরন্তর সংগ্রাম চলল। মৃত্যু যতই এগিয়ে এল কীট্‌স্ ততই শান্ত হয়ে এলেন। সেভার্নকে একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, "কখনো কাউকে মরতে দেখেছ? না? তাহলে তোমার জন্য দুঃখ বোধ করছি। আমার জন্য কত ঝঞ্ঝাট আর বিপদেই না পড়েছ। কিন্তু এখন তোমাকে শক্ত হতে হবে। শেষ হয়ে যেতে বেশিক্ষণ লাগবে না।"

২৩শে ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার, বিকেল বেলা। মৃত্যু ঘনিয়ে এল। রাত প্রায় এগারোটা। কীট্‌সের শেষ কথা : "সেভার্ন—আমি—তুলে ধরো, আমার মৃত্যু এসেছে। আমি শান্তিতে মরব। ভয় পেয়ো না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এতদিনে মৃত্যু এল।"

সেভার্নের কোলে কীট্‌সের প্রাণ বেরিয়ে গেল। যেন ঘুমিয়ে পড়লেন। মৃত্যু অক্ষয় করে রাখল ছাব্বিশ বছরের তারুণ্যকে।

রোম শহরের একপ্রান্তে অবহেলিত একটি সমাধিস্থান। নিস্তব্ধ নির্জন পরিবেশ। খোলা জায়গা; গাছপালা বড় নেই; আছে বুনো ফুলের বন! আর দাঁড়িয়ে আছে কত মৃত্যুর নীরব সাক্ষী হয়ে সেস্টিয়াসের পিরামিড।

কিছুদিন আগে শেলীর ছেলেকে এখানে কবর দেওয়া হয়েছে। দু'বছর পর শেলীকে এখানে কবর দেওয়া হয়েছিল। কীট্‌সের জন্যও নির্বাচন করা হল এই সমাধিক্ষেত্র। স্বদেশ থেকে বহু দূরে পিরামিডের ছায়ায় কীট্‌সের শেষ শয্যা রচনা করল কয়েকজন বন্ধু। মাটি দেবার আগে তাঁর বুকের উপর রেখে দেওয়া হল ফ্যানির সেই না-খোলা চিঠি।

কত মৃত্যুর সঙ্গী ডাক্তার ক্লার্ক, তাঁর দু'চোখ সহসা বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে উঠল। তিনি কবরের আলগা মাটির উপর কয়েকটি বুনো ফুলের গাছ লাগিয়ে দিলেন। শেষের দিকে কীট্‌সের প্রায়ই মনে হত, তাঁর দেহ ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছে, আর সেখানে ফুটে উঠছে অজস্র ফুল।

সেভার্ন বড় ক্লান্ত; নিজের পায়ে দাঁড়াবার শক্তি পর্যন্ত নেই। এক জনের ওপর ভর দিয়ে সে বন্ধুর শেষ যাত্রার আয়োজন দেখছে। তখন কে জানত সেভার্ন নিজের সমাধিক্ষেত্রেই দাঁড়িয়ে আছে! একষট্টি বৎসর পরে ইতালিতে সেভার্নের মৃত্যু হয়। বন্ধুরা কীট্‌সের পাশে তাকে কবর দিয়েছিল।



মৃত্যুর নয় দিন পূর্বে কীট্‌স্ সেভার্নকে ডেকে বললেন, "আমার কবরের উপরে এই কথা কয়টা লিখে দিও : Here lies ont whose name was writ in water."

তাঁর জীবনটা জলের দাগ ছাড়া আর কী? যাকে ভালোবেসেছিলেন তার হৃদয়ে প্রেমের স্বাক্ষর রেখে যেতে পারলেন না; যে-কাব্যসাধনা ছিল তাঁর প্রাণ, জীবিত থাকতে কেউ তার স্বীকৃতি দিল না। জলের আলপনা যত সুন্দর হোক, নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে যায় কয়েক মুহূর্তে।

সেই জলের আলপনা আজ সোনার আলপনা হয়েছে। ভবিষ্যতের এই ইঙ্গিতটুকু সেদিন পেলে কত শান্তি বুকে নিয়ে মরতে পারতেন কীট্‌স্!

জলের নয়, সোনার আলপনা! বিশ্বসাহিত্যের বুকে ঝক্ ঝক্ করছে।

1 July 1819. "Letter you must write immediately and do all you can to console me in it — make it rich as a draught of poppies to intoxicate me — write the softest words and kiss them that I may at least touch my lips where yours have been ... I almost wish we were butterflies and lived but three Summer days — Three such days with you I could fill with more delight than fifty common years could ever contain."

8th July —



Scanned with CamScanner